দুর্গাপূজা সকলের কাছেই খুব প্রিয় উৎসব। এই উৎসবে শহরবাসী মেতে ওঠে আনন্দের অনাবিল অর্ণবে। কিন্তু এই বছরের পুজোর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থাৎ আমাদের সকলকে অবশ্যই কোভিদ বিধি মেনে, মায়ের আগমনকে সাদরে বরণ করতে হবে। অন্তরের আকুলতা-মিশ্রিত ভক্তিই হোক দেবীর আরাধনার অঞ্জলি। বাহ্যিক আড়ম্বরের ব্যয় কমাতে হবে, এই সিন্ধু সিন্ধু অর্থ দিয়েই গড়ে তোলা যায় মানবের প্রাণদায়ী অক্সিজেন প্ল্যান্ট। তাই বেজে উঠুক আগমনীর শঙ্খধ্বনি শুভ চেতনা নিয়ে...

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ৩, সংখ্যা ৫
অক্টোবর ২০২১

কলম হাতে

ডাঃ অমিত চৌধুরী, দীপঙ্কর সরকার, শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী, কেতকী চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ মোদক, মায়াশিখা চক্রবর্ত্তী, এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

নব আনন্দের আশার বীজ নিয়ে মায়ের আগমনী।
বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে দাও মা তোমার অভয় বাণী।।

(নীলাঞ্জনা)

প্রতি বছরের মতোই এ বছরও পুজো মানে একরাশ আনন্দের শুভাগমন। শারদীয়া শুধুমাত্র পুজোর আমেজ আনে, তা কিন্তু নয়। তার সাথে জড়িয়ে থাকে অসংখ্য মানুষের জীবন আর জীবিকা। এই কয়েকটা দিন একটু বেশি উপার্জনের আশায় দিন গোনে দিন-আনা-দিন-খাওয়া মানুষগুলো। এই সকল শ্রমজীবি ও কর্মী মানুষগুলোর মধ্যে দিয়েই যেন আমাদের পুজোর আনন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, আমরা সেই কামনাই করি।

তবে পুজো মানে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় নয়। মায়ের পুজো মানে ভক্তিরসের আয়োজন করা, আড়ম্বরের আতিশয্য প্রকাশ করা নয়। কারণ বর্তমান পরিস্থিতির সাপেক্ষে বলা যায়, এখন অতিরিক্ত আতিশয্য করার অর্থই হল জীবন তথা অর্থনীতিকে একধাপ পিছনে ঠেলে দেওয়া। তাই আমাদের উচিত পুজোর আনন্দ-উল্লাস ভক্তি, জ্ঞান আর ভালোবাসা দিয়ে গড়ে তোলা।

প্রতিবারের মতোই আমরা দুর্গা মায়ের আশিস নিয়ে শারদীয়ার লেখায় লেখায় ভরিয়ে তুলেছি ‘গুঞ্জন’এর শারদ সংখ্যাটি। আশা করি, আমাদের এই সংখ্যাটি সমস্ত পাঠক ও পাঠিকাদের মনোগ্রাহী হবে।

বিনীতাঃ রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা), সম্পাদিকা, গুঞ্জন
বিনীতঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে), নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন

কলম হাতে

কলম হাতে

পাণ্ডুলিপির তরফ থেকে
সকল লেখক, পাঠক ও শুভাকাঙ্খী
বন্ধুদের জানাই
শারদীয়ার আন্তরিক অভিনন্দন...

https://www.facebook.com/groups/1833647555538153

নিবন্ধ

জীবন বংশীর জয়ধ্বনি

জয়রাজ পাল

শব্দের গভীরতায় চিন্তা-চেতনার নরক যন্ত্রণা ধুয়ে জ্যোৎস্নার চন্দ্রবিন্দু এঁকে যাওয়া মোহন বাঁশির সুর, একগাদা মুক্তির খোঁজে ত্রস্ত পায়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে আচমকা উঠে দাঁড়ানো পৃথিবীর বীভৎস বাতাসে আজ মিশে গেলেই আমার দূষিত গলির মোড়ে মোড়ে তিন হাত জমির অনিদ্রিত প্রার্থনা নিয়ে ফুটে ওঠে পদ্মফুল; চাপা কান্নার লুকোনো ঢোক গিলে শোষণের গুপ্ত সাম্রাজ্য পুড়িয়ে ফেলা আগুন থেকে ঝরে পড়ে অতিদীর্ঘ উল্লাসের কৃষ্ণচূড়া। মনে হয় সুখস্মৃতির ছন্দ-তালে নৃত্য করা মনময়ূরি এক্ষুনি তার পালকের সবটুকু অভ্র ও আবীর ছড়িয়ে ভেসে যাবে ভাদ্রের প্রবাহিণী প্লাবনে।

এমনকি অকাল বৈশাখের ঝড়ো হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে ওঠা প্রকৃতিও তার বুক চাপা আশঙ্কা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহাশূন্য বরাবর ছেড়ে দিতে... টলমল জলভরা নদীর মতো নির্জনে ছুটে আসবে অনুরাগের মেঘলোকে, নীল আকাশের সমস্ত স্বাদ-স্বচ্ছলতা পূর্ণ করে তুলবে তার মন্ত্রমুগ্ধ আতশবাজির ছড়াছড়িতে।

আর তাই বলেই হয়তো শত সহস্র বছর আগে ক্লান্তির আঁচল ছেড়ে মায়ার টান বাড়িয়ে দেওয়া ওই মধুর ধ্বনি

নিবন্ধ

শুনতে পেলেই... ভাঙা মন্দির ও একলা পূজারী দুজনেই যুগ-যুগান্তরের সৃষ্টিকারী সেই হৃদয় মূর্তির জীবন্ত সান্নিধ্যে আসতে একত্রে বেরিয়ে পড়তেন লোভ-লালসার সকল নিরাপত্তাবেষ্টনী এড়িয়ে।

তখন মনে মনে ভাবতাম প্রচলিত ঢেউয়ের তুফান ভেঙে ঈশ্বরের নিকট নিজেকে সমর্পণ করার এমন আপ্রাণ চেষ্টা হয়তো কোনো নগ্ন-নির্লজ্জ-নিষ্কাম ইতিহাসকে অসময়ে নেমে আসা বৃষ্টির অঝোর ধারায় ভিজিয়ে দিতে, নতুবা নিজের আত্মিক পরিচয় খুঁজতে থাকা রক্তমাংসের পোড়া গন্ধে স্বর্গ-নরক পারাবার এক করে দিতে।

আসলে এখন স্পষ্ট বুঝতে পারি, জাদুকরী আকর্ষণের ওই এক রহস্য আজও কেন ধুলোয় লুটানো যৌবনের ব্যালকনিতে থরে থরে সাজানো অধার্মিক হিংসায়, অলীক চাহিদায় বিলিয়ে দেয় প্রেম-পুণ্যের মৃদু সুরভী, এবং দহনকালে চিড় খেয়ে যাওয়া প্রতিশোধের প্রতিবাদে প্রতিক্ষণে শুনিয়ে যায় সূর্যস্নাত জীবনের জয়ধ্বনি। কেননা বংশীধারীর অন্তরেই যে আঁধার রাতের রূপ-লাবণ্য আঁকড়ে ধরে ঝলমল তরঙ্গে ডুব দেয় রৌদ্রদগ্ধ দিনের নিবিড় নিভৃত আলিঙ্গন। ■

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

পঞ্চম পর্যায় (২)

আজ ২১শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার। সকাল ছয়টার সময় কুয়াশার মধ্যে বেড়িয়ে পড়েছি। কাকাজী সকালেই বলে রেখেছেন কোনো সময় নষ্ট নয়। তাই বিরামহীনভাবে হেঁটে চলেছি। একটি ৮/১০ বছরের বাচ্চা ছেলে তার দাদুর সাথে ক্লান্তিহীন ভাবে পরিক্রমা করছে, দেখে অবাক না হয়ে পারছি না।

সকাল দশটা। এলাম গনেরা গ্রামে। একটু বিশ্রামের প্রয়োজন জল-খাবার দরকার, তাই রাস্তার পাশে একটি ছোটো চায়ের দোকানে বসতেই হল। আবার চলা শুরু। মাঠের পথ বামপাশ দিয়ে চলেছে একটা লম্বা খাল। স্রোত দেখে মনে হলো ভালোই গভীর। আর ডানদিকে ভরা চাষের জমি। বেশ কিছুটা যাওয়ার পরে একটি ছেলে আমাদের দূরে একটি আশ্রম দেখিয়ে বললো, "মহারাজ ঐ আশ্রমে যান, ঐ স্থানটি খুবই পবিত্র। সব পরিক্রমাবাসী ঐ আশ্রমে যান।" কাকাজী কিছুতে যেতে রাজী হলেন না। কারণ ঐ এক – দেরী হয়ে যাবে। কিন্তু দিব্যানন্দজী আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন ঐ স্থানে যাওয়ার জন্য। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাকাজীকে যেতেই হল। আশ্রমের মহারাজ সৌম্যকান্তি রামানন্দ ব্রহ্মচারী আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। এই স্থান সম্পর্কে উনি ওনার গুরুদেব ১০৮ মহানন্দ

ব্রহ্মচারীর কাছে যা শুনেছেন তা উনি আমাদের বললেন, "কোনো এক সময় এক ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করতেন। প্রত্যেক দিন সকালে তাঁর সাদা গাই গোরুটিকে দুধ দুইবার জন্য এখানে নিয়ে আসতেন। পাশেই একটি জলাশয় ছিল। বাছুরটিকে তার মায়ের কাছ থেকে মেরে দূরে কোথাও বেঁধে রাখতেন। বাছুরটি তার মাকে তার নির্যাতনের কথা বলে। পরের দিন, ব্রাহ্মণ তাঁর ছেলেটিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। তিনি যখন বাছুরটিকে দূরে কোথাও বাঁধছেন, তখন গোরুটি ব্রাহ্মণ পুত্রকে পুকুরের জলে ঠেলে ফেলে দেয়। যথা সময় ব্রাহ্মণ গোরুটির দুধ নিয়ে বাড়ি চলে যান। কিন্তু পুত্রের কোনো সন্ধান আর পান না। রাতে মা নর্মদা স্বপ্নে ব্রাহ্মণকে সব বৃত্তান্ত বলেন এবং ঐ পুকুর থেকে পুত্রটিকে তুলে, পাশে একটি চতুষ্কোন জলাশয়ের জল পুত্র এবং গোরুটির গায়ে ছিটিয়ে দিতে বলেন। কারণ ব্রহ্ম হত্যার দায়ে গোরুটির রং সাদা থেকে কালোতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

পরের দিন সকালে ব্রাহ্মণ মা নর্মদার কথা মতো সবই করলেন। পুত্র জীবিত হল এবং গোরুটির গায়ের রং পূর্বের মতো সাদাও হয়ে গেল। মা নর্মদা ব্রাহ্মণকে আরও বলেছিলেন, এই চতুষ্কোণ জলাশয়ের জল কোনো বন্ধা নারী যদি পান করে, তাহলে তার গর্ভ সঞ্চার হবে।"

রামানন্দ মহারাজ যা ব্যাখ্যা শোনালেন আমি তাই হুবহু এখানে উপস্থাপন করলাম। জায়গাটির নাম গোঘাট।

দুপুর সাড়ে বারোটার সময় ভোজন পর্ব শেষ করে রাস্তায়

নেমে এলাম। প্রচণ্ড সূর্যের তাপ। চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে তিন কিলোমিটার হেঁটে সেই খালের পাড়েই আবার এসে পড়লাম। যতদূর দেখা যাচ্ছে শুধু চাষ। কোনো বড়ো গাছ নেই, কোনো খাবার জলের কল নেই। নুন্যতম বিশ্রাম নেবার কোনো জায়গা নেই। প্রখর দারুন অতি দীর্ঘ দগ্ধ দিন।

দুপুরে গোঘাটে ভোজন পর্ব শেষ না করলে আজ কোথাও খাবার জুটতো বলে মনে হয় না। কারণ কোনো গ্রামই তো নেই। আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। সব কিছু দুটো করে দেখতে শুরু করেছি এবং খালের জলকে মনে হচ্ছে পিচ ঢালা রাস্তা, ভ্রান্তদর্শন হচ্ছে। কাকাজী এবং দিব্যানন্দজী প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। ডাকলেও শুনতে পাচ্ছেন না। এমতাবস্থায় আমরা পাশে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লাম। মাঠের থেকে একটি লোক এসে আমাদের জল খাওয়ালো। রাস্তার উপরেই প্লাস্টিক সীট পেতে বসে পড়লাম আমরা। মিনিট ১৫ পরে আবার হাঁটা শুরু করেছি। এখানে বিশ্রাম না নিলে রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে যেতাম, এতটাই রোদের তাপ। এবারে দিব্যানন্দজীকে বললাম গ্রামের পথ ধরতে।

এখন বিকাল চারটে। সূর্যের তাপ একটুও কমেনি। গ্রামের পথ ধরলাম ঠিকই, কিন্তু অনেক দূরে-দূরে বাড়ি। প্রায় একঘণ্টা চলার পর একটা চায়ের দোকানে কাকাজী শুয়ে পড়েছেন। তাহলে কাকাজীরও কষ্ট হয়! সঞ্জয় সবিস্ময়ে আমাকে প্রশ্ন করল। প্রায় আধ ঘণ্টা এখানে বিশ্রাম নিয়ে যখন চলা শুরু করলাম, তখন পা ভারী হয়ে গেছে। হাঁটার ক্ষমতা

আর নেই। কিছু করারও নেই, এগিয়ে চলেছি। প্রায় সন্ধ্যে হয়ে আসছে, অথচ থাকার জায়গা এখনো পাইনি। একটি বাচ্চা ছেলে তাদের বাড়িতে থাকার কথা বললেও দিব্যানন্দজী রাজী না হওয়ায় অনন্যোপায় হয়ে এগিয়ে চলেছি। মাঠের মাঝেই সন্ধ্যে নামল, হেঁটে চলেছি। কোনো গাছপালা বা কোনো পোড়ো ভাঙ্গা বাড়িও দেখতে পাচ্ছি না। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময় একটি গ্রামে প্রবেশ করলাম।

আহারখেড়া। আমাদের আহারের প্রয়োজন নেই। শুধু একটু ঘেরা জায়গা হলেই চলবে। প্রায় রাত আটটার সময় সে রকম একটি জায়গার সন্ধান পাওয়া গেল। বুক সমান উঁচু ঘেরা মাথায় টিনের ছাওনি দেওয়া একটি আস্তানা। সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথজীর একটি ছবি দেখলাম। এক বৃদ্ধ এসে বললেন, "থাকুন কিন্তু কোনো কিছুর ব্যবস্থা নেই।" প্রায় ৪০ কিলোমিটার হাঁটার পর শোয়াটা যে কত প্রয়োজন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।

গাছের ডাল ভেঙে দিব্যানন্দজী জায়গাটাকে থাকার উপযোগী করে পরিস্কার করলেন। আশ্চর্যের বিষয় দুপুরে যে রকম গরম লাগছিল সূর্য ডোবার পর ঠিক সেই রকম শীত করছে। মনে হচ্ছে ঠান্ডা দশ ডিগ্রির আশেপাশে হবে। কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে। কোনো রকমে কম্বলের তলায় শরীরটাকে ছুঁড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

নর্মদে হর। ...ক্রমশ ■

শিকড় (গাঁ গেরামের গপ্পো)

(১১ পর্ব)

দীপঙ্কর সরকার (বাংলাদেশ)

জঙ্গল শেষ হলে গ্রামের পূর্বদিকে হাঁটতে থাকলেন দাদু। দাদুকে অবাক বিস্ময় নিয়ে দেখছেন গ্রামের মানুষ। কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করছেন ইনি কে হন! ভারত থেকে দাদু এসেছেন শুনে ওদের চক্ষু তো চড়কগাছ। এমনও হয়! গ্রাম দেখতে মানুষ আসে কিংবা ফেসবুকে যোগাযোগ হয়ে মানুষ এতোটা দূরে আসতে পারে সেটা ওদের ধারণাতেই নেই।

হাঁটতে হাঁটতে পূর্বদিকের স্লুইসগেটে পৌঁছে গেলাম। নালার উপর একটি স্লুইসগেট। যে নালাটা মাঠ থেকে ছুটতে ছুটতে নদীতে এসে পৌঁছেছে। স্লুইসগেট হবার আগে ভীষণ ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে গ্রামবাসীদের। সেই সময়ে বাঁশের সাঁকোই ছিল নালাটা পার হওয়ার একমাত্র মাধ্যম।

২০০৯ সালের দিকে স্লুইসগেট নির্মাণের কাজ শুরু হল। বিপুল পরিমাণ রড, সিমেন্ট, পাথর আনা হলো আমাদের গ্রামে। সঙ্গে অনেক অপরিচিত মানুষ; কাজ করার জন্য এসেছে। আমাদের গ্রামেই থাকবে। থাকার জন্য পার্টটাইম ঘর তৈরি করে নিল ওরা। শুরু হল জীবনের আয়োজন। স্লুইসগেটের সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণ হতে থাকে জীবনের গল্প।

উৎস

ওদের মুখে উঠে আসে জীবনসংগ্রামের এক নির্মোহ কাহিনী – যা আবহমান গ্রামবাংলার নিরস জীবনের খণ্ডচিত্র। সেই খণ্ডে যুক্ত হয় শ্রমিকের হতাশা, আশা, আকাঙ্ক্ষার সুস্পষ্ট প্রতিফলন।

জীবন এগিয়ে চলে নতুন ভোরের প্রত্যাশায়। ভোর কি আসে? হয়তো আসে। তাছাড়া জীবনের জন্য এত আয়োজন; এতো উচ্ছ্বাস কেন! জীবনের পেয়ালায় গরল রসাস্বাদন করতে করতে একদিন হয়তো অমৃতের দেখা মিলবে; সেই আশাতেই পথ চলাকে হয়তো জীবন বলে। স্লুইসগেট নিয়ে আমাদের তখন প্রচুর আগ্রহ। কেমন বিশাল হবে; কতদিন লাগবে কাজ শেষ হতে; এর ম্যাকানিজম কি; স্লুইসগেট হতে লাফ মারা যায় কি না এসব তখন আলোচনার বিষয়বস্তু।

অবশেষে স্লুইসগেট নির্মাণ করা হল। আমরা ছোটরা এর আকার দেখে মোটেও খুশি হয়নি। আমরা ভেবেছিলাম এখানে বিশাল এক সেতু হবে; আমরা বর্ষাকালে সেই সেতুর ওপর থেকে লাফ মারতে পারবো। অবশেষে এর আকার এতো ছোট হল – যে তা আমাদের কল্পনার সেতুর সাথে একেবারে বেমানান।

স্লুইসগেট নির্মাণ শেষে শ্রমিকেরা চলে গেল। এতদিন এখানে সর্বক্ষণ কোলাহল ছিল। ওরা চলে যাবার পর জায়গাটা আবার নীরব হয়ে গেল। স্লুইসগেট নির্মাণের জন্য যে পাথর, রড, সিমেন্ট আনা হয়েছিল সেগুলো পাহারা

দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন এক দাদু। সেই দাদুর সঙ্গে সবার বেশ খাতির জমে গেল। যাবার আগে অনেকে তাঁকে বাড়িতে ডেকে খাইয়েছেন।

দাদুর চলে যাওয়া আমাদের মনেও এক শূন্যতার সৃষ্টি করে। মাত্র তো কয়েকটা মাসের পরিচয়; তবুও কোথাও যেন মানুষগুলো থেকে যান। জীবনের প্রয়োজনে ওঁদেরকে ঘাঁটি বাঁধতে হয় এক ঘাট হতে অন্য ঘাটে, তবুও চাইলেও সব মুছে ফেলা যায় না বলে মানুষের স্মৃতিপটে জমা হতে থাকে জানা-অজানা, চেনা-অর্ধচেনা-অচেনা কত শত মুখচ্ছবি। স্মৃতির পঙক্তিমালা গলায় জড়িয়ে ছুটতে থাকে জীবন।

দিন সাতেক হলো তবুও বন্যার জল কমে যাওয়ার নাম নেই। জল আরো বাড়তে থাকে। স্লুইসগেটের দু'পাশের পানি প্রায় ছোঁয়া ছোঁয়া অবস্থা। পানির স্রোতে পাড় ভেঙে গেলে অবস্থা আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। গভীর রাতে ঘুম ভাঙে যুগলের। গিয়ে দেখে পাড় প্রায় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। গ্রামের সবাইকে ডেকে তোলে যুগল। ধরফর করে ঘুম থেকে ওঠে ওরা। কাঁচাঘুম ভেঙে হাতে কোদাল নিয়ে সবাই ছুটে চলে স্লুইসগেটে। মিলেমিশে স্লুইসগেটের পাড়ে মাটি দিতে থাকে।

গভীর রাত। পরিশ্রান্ত গ্রামবাসী। নদীর জলতরঙ্গ কানে সুরের মতো বাজে। এ সুর যেন এক করুণ সুর; হৃদয় ভাঙার সুর। ঢেউগুলো নদীর পাড়ে গিয়ে সজোরে আঘাত

হানছে। খুব কাছ হতেই একটা শব্দ কানে এলো; পাড় ভাঙার শব্দ। মুহূর্তেই বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে; মনে হয় কেউ যেন ধ্বংসের খেলায় মেতেছে। নদীর ঢেউ ছাড়া আর কোন শব্দ কানে আসে না। নিশ্চুপ নিস্তব্ধ রাতে পল্লীর নীরবতার সাথে যুক্ত হয় নিরুপায় জলতরঙ্গ। ক্লান্ত শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দিতেই ঘুম চলে আসে। সকালে ঘুম ভাঙতেই আবার বৃষ্টির শব্দ কানে আসে। বর্ষাকালে গবাদিপশুর কষ্ট সবচেয়ে বেশী।

সকাল সকাল ঘুম হতে উঠেই আমরা ভাই-বোন পড়তে বসি। কিসের পড়া? পড়ার ভান করে বসে থাকা। দুজনে বুদ্ধি করলাম; তল-উপর খেলবো। তল-উপর খেলা মানে – কেউ যদি তল চায় একটা বইয়ের নীচের পৃষ্ঠায় যতটা ছবি আছে সে ততটা মারবে আর কেউ যদি উপর চায় বইয়ের উপরের পৃষ্ঠায় যতটা ছবি আছে সে ততটা মারবে। খেলার এক পর্যায়ে সজোরে মার; মুহূর্তেই কান্নাকাটি। শুরু হয় ভাই-বোনের ঝগড়া। শৈশবের সবচেয়ে মধুরতম ঝগড়া।

এভাবেই জীবন এগিয়ে চলে; শৈশব ফুরোতে থাকে; শৈশব-কৈশোর-যৌবন-বার্ধক্য ক্রমানুসারে জীবনচক্রও চলতে থাকে। এক ঘাটের আয়োজন সাঙ্গ করে অন্যঘাটে হারিয়ে যায় কিছু মুখ। এ হারিয়ে যাওয়া মানে অদৃশ্য হওয়া; মানুষের মুখে মুখে গল্প হয়ে বেঁচে থাকা। এরা হারায় না, কারণ, মানুষ মরে না; কোন না কোনভাবে ঠিক থেকে যায়...

...ক্রমশ ■

সবিনয় নিবেদন

‘গুঞ্জন’ কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের ‘ই-মেল’ (contactpandulipi@gmail.com) এ পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু’ট ফরম্যাটই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর ‘পাণ্ডুলিপি’ ‘গ্রুপে’-তো অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: নভেম্বর ২০২১ সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১৫ই অক্টোবর, ২০২১

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ করোনা বিদায় কর মা...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জি ✧ বয়সঃ ১২ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

শারদীয় ভাব

সামিমা খাতুন

মস্ত নীল মসলিন খোলে,
পেঁজা তুলোর বুনন চলে,
বছর ঘুরে শরৎ কালে,
আসেন উমা স্বর্গ ফেলে।

বাতাসে হাল্কা হিমের ছোঁয়া,
ঘাসের ডগা শিশির ধোয়া।
পুজোর আমেজে মাতাল হাওয়া,
আলোচনা মুখর গ্রামের দাওয়া।

পুজোর গন্ধে ফেরার মন,
নাচের তালে কাশের বন,
দিন গোনাতে দিন যাপন,
বলো মাগো আসবে কখন! ■

শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা
সকলে সুস্থ থাকুন, মাস্ক পড়ুন এবং দূরত্ব বজায় রেখে শারদীয়ার আনন্দ উপভোগ করুন ।

নতুন বই
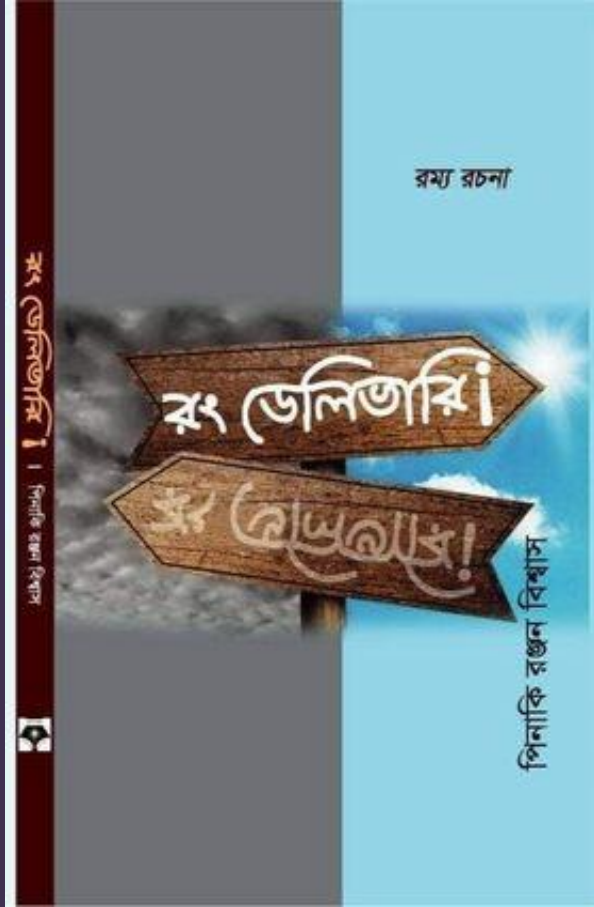
প্রতি পাতায় ভরা হাসি
যা কখনও হয়না বাসী...

সুসাহিত্যিক পিনাকি রঞ্জন বিশ্বাসের একটি অপূর্ব রম্য রচনার সমাহার...

প্রাপ্তিস্থলঃ

https://www.rokomari.com/book/202818/rong-delivery

ভারতে শীঘ্রই আসছে...

অনুরূপতা দুর্গা

শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী

যোগেনের ছোট ছেলেমেয়ে দুটি পুকুরের পাশ দিয়ে কাশফুলের বনের মধ্যে দিয়ে ছুটে গাঁয়ের বাড়ির থেকে অনেক দূরে মাঠে খেলতে গিয়ে দেখলো, আজকে খেলা হচ্ছে না। উল্টে তাদের সব বন্ধুবান্ধব নতুন জামা-প্যান্ট পরে হৈ হৈ করছে।

বিট্টু আর মিট্টুকে দেখে তারা বলল, “এ কিরে, তোরা নতুন জামা-প্যান্ট পড়িসনি কেন? আজকে দুগ্গা পূজার অষ্টমী তিথি তো? সকালবেলা ঠাকুর বাড়িতে দুগ্গা ঠাকুর দেখে, এখন সবাই মিলে গপ্পো করছি। বাড়িতে মা নুচি-আলুরদম করছে, একটু পরে গিয়ে সব খাবো।” বিট্টু-মিট্টু কিছু বলল না। বাড়ি থেকে আসবার সময় মা দুটি করে আটার নুচি আর আলুর চচ্চরি দিয়ে বলেছিল, “আজকে এইগুলো খেয়ে নে, বাবা ফিরে এলে ময়দায় নুচি, আলুরদম আর একটু পায়েস করে দেবোক্ষন।”

দলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দীপক একটু বড়, সে বলে উঠল, “কি রে, তোরা নতুন জামা-প্যান্ট পরিসনি কেনে? দুর্গাপূজার সময় নতুন জামা-প্যান্ট পরে ঠাকুরতলায় গিয়ে ঠাকুর দেখতে হয় রে।”

দুর্গতিনাশিনী

বিট্টু-মিট্টু কোন রাখঢাক না রেখে বললো, "বাবা বলেছে একাদশী থেকে আমাদের দুর্গাপূজা শুরু। কলকেতে থেকে বাবা এসে আমাদের নতুন জামা-প্যান্ট কিনে দেবে, কত কি ভালো-ভালো খাবার খাবো আমরা, আনন্দ করবো, জানো তো দীপুদা, একাদশী থেকে আমাদের দুগ্গাপুজো শুরু হয় গো। কোনো প্রতিমা নেই, পুজো নেই, চারিদিকে যখন সব চুপচাপ হয়ে যায়, তখন আমাদের ঘরে দুগ্গাপুজো হয় গো। না কোন প্রতিমা থাকে না গো, আমরা দু'ভাই-বোন, বাবা-মা, ঠাকুরদা-ঠাম্মা নতুন কাপড়-জামা পরে চারদিন ভালো-মন্দ খেয়ে মন দিয়ে মায়ের পুজো করি গো। আমরা ঠিক জানি গো, দুগ্গাঠাকুর আমাদের ঘরে আসে গো, আমাদের পুজোটা অন্য দুগ্গা। হ্যাঁ, বাবা বলেছে গো।" তাদের কথা শুনে সবাই খিল খিল করে হাসতে লাগল।

প্রতি বছর যোগেনের কাছে কলকেতে থেকে ডাক পড়ে ঢাক বাজবার জন্য, ঢোল বাদক কাল্লুকে নিয়ে সে কলকাতা পাড়ি দিত। পঞ্চমীর দিন সন্ধ্যাবেলা পৌঁছে যেত। ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করত। মোটা টাকা মজুরি দিত। ভালো বাজাতে পারলে বিশেষ করে আরতির সময় মেলে অনেক বাবুর থেকে মোটা বকশিস। যোগেন জাদরেল ঢাক বাজিয়ে, কাঁধে ঢাক ঝুলিয়ে নাচতে নাচতে চক্রাকারে ঘুরে সে যখন ঢাক বাজাত তখন সে নিজেই মোহিত হয়ে যেত, তাকে থামানো যেত না। ঢাক তো

দুর্গতিনাশিনী

অনেকেই বাজায়, কিন্তু ঢাকের যতরকম বোল আছে, যোগেন বাজাতে পারত, তাই তার খুব কদর মিলত। প্রচুর টাকা, জামা কাপড়, বাড়ি আসার সময় নানারকমের খাবার দাবার মিলতো। কিন্তু এই বছর করোনার জন্য ডাক পড়েনি। ছোট ছেলে-মেয়ে দুটির মুখের দিকে সে তাকাতে পারছে না।

এই গল্পের উৎসস্থল কিন্তু বাঁকুড়ার বাঁকি-সেঁদড়া গ্রাম। বংশ-পরম্পরায় ঢাক বাজিয়ে – এটাই তাদের জীবন ও জীবিকা। সারা বৎসরের মধ্যে এই দুর্গাপুজোয় তাদের সবচেয়ে বেশি রোজগার হয়, সঙ্গে মেলে নানান অনুদান। বাঁকুড়া শহর থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে, এই গ্রামকে অনেকেই 'ঢাকিদের গ্রাম' বলেই চেনেন। এখানকার প্রায় ৯৫ টি পরিবার মূলত উৎসব-অনুষ্ঠানে ঢাকের বাজনা বাজিয়ে সংসার চালান। কিন্তু উৎসবের মরশুমে বাড়তি রোজগারের আশায় সিংহভাগ ঢাকিই পাড়ি দেন ভিন রাজ্যে। পুজোর দিন পাঁচ আগেই তাঁরা রওনা হয়ে যান সুদূর পঞ্জাব, উড়িষ্যা, বেনারস, গুজরাট ও কলকাতার পুজো মণ্ডপগুলির উদ্দেশ্যে। তাঁদের ঢাকের বাদ্যিতে যখন উৎসব মুখর হয়ে ওঠে ওই দূর দেশের পুজো মণ্ডপগুলি, ঠিক তখন বাঁকি-সেঁদড়া গ্রামে শিশু, বৃদ্ধ আর মহিলারা পথ চেয়ে বসে থাকেন কখন ফিরবে তাঁদের প্রিয় ঘরের

মানুষটি। তিনি বা তাঁরা বাড়ি ফেরা মানেই আগামী কয়েকটা দিন সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখা।

ভিন রাজ্যের পুজো মণ্ডপগুলিতে ঢাকের তালে নেচে ওঠা মানুষগুলিকে দেখে বোঝারও উপায় থাকে না যে – দূর বাংলার কোনও এক গ্রামে এই মানুষগুলির অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছেন তাঁদের স্ত্রী, সন্তান আর বৃদ্ধ বাবা-মায়েরা। আর আলো ঝলমলে মণ্ডপে মণ্ডপে ঢাকের বোল ফোটানো মানুষগুলিরও মন পড়ে থাকে গ্রামে লণ্ঠনের আলো জ্বলা ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটিতে। কিন্তু পেট বড় বালাই। তাই উৎসব আনন্দের দিনগুলিতেও প্রিয় মানুষটির হাত ধরে শহরের মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে বেড়ানোর বদলে ঢাক কাঁধে পাড়ি দিতে হয় ভিন রাজ্যে। কারণ এসব তাদের কাছে স্বপ্ন। পুজো শেষে বাবা-কাকারা ঢাক কাঁধে ফের বাড়ি ফিরলে ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়ের মুখে ফুটবে হাসি। উৎসব শেষে পরনে জুটবে নতুন জামা।

এখনও মেলেনি বায়না, করোনা আবহে দুর্গাপুজোর অনিশ্চয়তায় ঢাকিদের জীবন, আর মাত্র কিছুদিনের অপেক্ষা... তারপরই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো দোরগোড়ায় চলে আসবে। করোনা ভাইরাসের সঙ্কটের জন্য এবার পুজোর জাঁকজমক কিছুটা কমলেও রীতি ও প্রথা মেনেই দুর্গাপুজো করা হবে কলকাতাসহ এ রাজ্যে। অন্যান্য বছরে এই সময় ঢাকিদের কাছে বায়না চলে

আসে পুজো কমিটিগুলোর কাছ থেকে। কিন্তু এ বছর তার ব্যতিক্রম হল। এখনও কোনও ঢাকির কাছে পুজোর বায়না আসে নি, সবে একটা দুটো করে আসতে শুরু করেছে। না আর বেশী অপেক্ষা করা যাবে না, পুজোর আর কয়েকটা দিন বাকি। কাল্লুকে নিয়ে ঢাক, ঢোল বাসের মাথায় বেঁধে যোগেন কলকাতাগামী বাসে চেপে পড়ল। সেখান থেকে সে নামলো বাবুঘাট। বাবুঘাট থেকে ঢাক কাঁধে নিয়ে পায়ে হেঁটে শিয়ালদা। ভাবা যায়, ঐ অতো ভারী ২৫-৩০ কে.জি. ওজনের ঢাককে নিয়ে হেঁটে চলা যে অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ সেটা উল্লেখ না করাই ভালো। নিশ্চয়ই মা দুর্গা ওদের শক্তি জোগান, তাই ওরা পারে। শিয়ালদহ পৌঁছে দেখে অসংখ্য ঢাকিদের লাইন পড়ে গেছে।

রাস্তার ধারে একটা সস্তার হোটেলে ভাত-ডাল তরকারি খেয়ে তারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করলো, আর দাঁড়িয়ে পড়ল ঢাকির লাইনে। দু-একটা পূজা কর্তৃপক্ষ ঢাকির বায়না করতে এল। পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত রেট বলছে পাঁচ হাজার টাকা, সঙ্গে থাকা খাওয়া ফ্রি। যারা রিস্ক নিতে পারছে না তারা রাজি হয়ে যাচ্ছে, বায়না নিয়ে নিচ্ছে। এমনি করে সর্বোচ্চ রেট সাত হাজার টাকা পর্যন্ত উঠল।

কাল্লু বললো, “ওস্তাদ সাত হাজার টাকায় রাজি হয়ে যাও তা না হলে শূন্য হাতেই আমাদের ফিরতে হবে।”

যোগেন বলল, “সাত হাজার টাকায় কি হবে? তোকে কি দেব, আর বাড়িতেই বা কি নিয়ে যাবো? এতগুলো মুখ হা পিত্যেশ করে বসে থাকবে। না কাল্লু, এখনো দু’দিন বাকি আছে, শেষমেশ দেখা যাক না কপালে কি আছে। আমি বলছি শোন, দেখবি মা দুগ্গা আমাদের একদম নিরেশ করবেনি গো।”

ঠিক একদিন আগে হাওড়া থেকে একটা ক্লাবের তিন-চারজন এলেন। তার মধ্যে একজন লম্বাপাড়ের পাজামা পাঞ্জাবি পড়ে আছেন, মাথায় টুপি, কপালে ইয়া বড় টিপ, লেতা হবেক বটে। সে এসে যোগেনকে বলল, “কেমন ঢাক বাজাতে পারিস আগে শুনি দেখি। ঢাক শুনে তবে তোর সঙ্গে কথা বলব।”

যোগেন হাত জোড় করে নমস্কার করে তার গুরুর মানে বাপের শেখানো শ্রেষ্ঠ ঢাকের বুলি বাজাতে আরম্ভ করল। শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে ভিড় জমে গেল। ঢাকের আওয়াজ শুনে সেই কর্তাবাবু খুশি হয়ে বলল, “পঞ্চমীর সন্ধ্যে থেকে একাদশী পর্যন্ত বাজাতে কত নিবি?”

“আজ্ঞে ১২০০০/- টাকা বাবু, সঙ্গে থাকা খাওয়া ফ্রি।”

বাবুটি বললেন, “একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না। আমি আবার দরাদরি পছন্দ করি না, ঐ ১০০০০/- হাজার টাকা পাবি, চারবেলা খাওয়া ও থাকা ফ্রি।”

যোগেন হাত জোড় করে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে বলল,

"অ্যাডভান্স কিছু দিন বাবু, আর নাম ঠিকানা ও বাসের নম্বর দিন।" বাবু পকেট থেকে ১০০০/- টাকা বার করে অ্যাডভান্স দিয়ে নাম-ঠিকানা লিখে দিলেন। যোগেন খুব খুশি হয়ে হাত জোড় করে মাথা নীচু করে বাবুকে প্রণাম করে বললে, "পঞ্চমীর দিন বেলাবেলি করে আমরা ঠিক পৌঁছে যাবো।" তেনারা চলে যেতে যোগেন দু'হাত জোড় করে উর্ধে তুলে বলল, "জয় মা দুগ্গা।"

তারপর পুজোর পাঁচদিন যোগেন আর কাল্লু যা বাজালো তাতে গোটা পাড়া মাত হয়ে গেল। আরতির সময় প্রত্যেকদিন আর বিশেষ করে অষ্টমীর দিন সন্ধ্যাবেলা ও সন্ধি পূজার সময় যোগেনের বাদ্যিতে সবাই মোহিত হয়ে গেল। ধুতি, স্যান্ডো গেঞ্জি পড়ে আর কোমরে গামছা বেঁধে আরতির সময় পায়ের কাছে ঢাক রেখে বাজাতে বাজাতে – হঠাৎ যোগেন ঐ অত বড় ঢাকটিকে কাঁধে তুলে বাজাতে লাগল। ধুপ, ধুনার গন্ধ আর পাড়ার ছেলেদের ধুনুচি নৃত্য শুরু হতেই যোগেন চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে এমন ঢাক বাজাতে লাগল যে চারিদিক থেকে প্রচুর প্রচুর দর্শনার্থীর ভিড় হয়ে গেলো। বায়না করতে যাওয়া সেই বাবু যোগেনের হাতে ১০০০ টাকা গুঁজে দিয়ে বলল, "নে বাজা, বাজা, যারা নাচছে তাদেরকে কাত করে দে।" যোগেন দুগ্গা মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "শক্তি দে মা।" তারপর সে তীব্র গতিতে ঘুরে ঘুরে ঢাকের যত রকমের বোল আছে

বাজাতে লাগল। কখন আরতি থেমে গেছে, কখন ধুনুচি নাচিয়েরা ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছে বা শুয়ে পড়েছে, সে জানে না। ঘূর্ণমান অবস্থায় যোগেন দেখতে পেলে মায়ের ত্রিনয়ন থেকে এক দিব্যজ্যোতি বেড়োচ্ছে, কাঁদতে কাঁদতে সে বলল, "মা, তুমি সবাইকে দেখো মা। মানুষকে এই দুর্দশা থেকে তুমি মুক্ত করো, ফিরিয়ে দাও শান্তির জীবন।"

যোগেনকে যখন ধরে থামানো হল তখন তার সারা শরীর ঘামে চপচপে ভিজে। হঠাৎ করে যোগেন হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। কর্মকর্তারা, দর্শকরা সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। যোগেনের চোখে-মুখে জল দেওয়া হল, কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে দেওয়া হল। খানিকটা ধাতস্থ হবার পর সবাই জিজ্ঞাসা করল, "তুমি ওরকম করছিলে কেন! শরীর খারাপ নাকি?" যোগেন খালি বলল, "আমি কিছু জানি না বাবুরা, কি এক অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে ভর করেছিল, আপনারা না থামালে আমি থামতাম না।" সবাই শুনে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। পুষ্পবৃষ্টির মত টাকা পড়তে লাগল। যোগেন সকলের দিকে হাত জোড় করে মাকে বলল, "এ সব তোমার খেলা মা।"

গ্রামের ছোট্ট বাড়িতে নতুন করে দুর্গোৎসব শুরু হল। এ যেন এক অন্য দুর্গা, লোক নেই, জন নেই, আলো নেই, উল্টে চারিদিকে উৎসবের পরে ঝিঁঝির নিস্তব্ধতা বিরাজমান। করোনা আবহে যে এত টাকা যোগেন রোজগার

করে আনতে পারবে, তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। জীবনে ঢাক বাজিয়ে এত টাকা সে কোনদিন রোজগার করতে পারেনি। ছেলে-মেয়ে, বৌ, বাবা-মায়ের নতুন জামা কাপড় হল। ভালোমন্দ খাবার বিশেষ করে ময়দার লুচি, আলুরদম ও পায়েস রান্না হল।

একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে ঘরে টাঙানো ক্যালেন্ডারের দুগ্গাদেবীর ছবির নিচে রেখে যোগেনসহ বাড়ির সবাই ঐ বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ছবির দিকে তাকিয়ে বলল, "ফি বছর তুমি এই সময়ে আমাদের ঘরে এসো মা, আমাদের কোন তাড়া নেই, খালি তুমি আমাদের মত লোকগুলোকে দেখো মা।" হঠাৎ করে ছবির দুগ্গা যেন ওদের চোখে জীবন্ত হয়ে উঠল। ■

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ

মুল্যঃ ৮০ টাকা [অনলাইনে কুরিওর শুল্ক অতিরিক্ত]

অ্যামাজন লিঙ্কঃ

https://www.amazon.in/gp/offer-listing/8194223695/ref=dp_olp_new_mbc?ie=UTF8&condition=new

এখন কলেজ স্ট্রীটেও পাওয়া যাচ্ছে।

ঠিকানাঃ আদি নাথ ব্রাদার্স, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট

কলকাতা – ৭০০০৭৩ ● দূরভাষঃ +৯১ ৩৩ ২২৪১ ৯১৮৩

আঁচল-পোড়া রঙ

দালান জাহান (বাংলাদেশ)

অতীতের জানালা দিয়ে যায়
বর্তমান পৃথিবীর ট্রেন
ঠোঁটে তোলে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে
বলে কতদিন,
কতদিন দেখিনি তোমায়।

বোশেখের সান্ধ্য ঝড়ে
কে উড়ায় আঁচল-পোড়া রঙ
ভিজিতে ভিজিতে বাদল নাচল
বন-বিহঙ্গ হয়ে মিশিতে সুর-লয়ে।

আমি তো মরে আছি
মরা কার্তিকের কৌণিক-বিন্দুতে
বহুকাল-বহুকাল ধরে। ■

'গুঞ্জন'এর ২০২১ এর বাকী সংখ্যাগুলির বিষয়বস্তু

নভেম্বর – দীপাবলি সংখ্যা

ডিসেম্বর – অণু সংখ্যা

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

পুজোর কেনাকাটা

কেতকী চট্টোপাধ্যায়

আমাদের ছোটবেলা কেটেছে হাওড়ার একান্নবর্তী পরিবারে। দাদু, ঠাকুমা, বাবা এবং কাকারা সবাই একসঙ্গে থাকতেন। মেজকাকা নৈহাটিতে চাকরি সূত্রে পরিবার নিয়ে থাকলেও মাসে অন্তত একবার বাড়ি আসতেন। সেজকাকা থাকতেন মধ্যপ্রদেশে। কিন্তু পুজোর বেশ কিছুদিন আগে সেজকাকীমা ও ওঁদের মেয়েকে রেখে যেতেন।

মহালয়ার দুই তিন দিন আগে বাবার সঙ্গে মা, মেজকাকীমা, সেজকাকীমা যেতেন পুজোর শাড়ী ও আমাদের জামাকাপড় কিনতে। তার আগে দাদু ও বাবা বড়বাজার থেকে বাড়ির সকলের পুজোর জামাকাপড় কিনে আনতেন। কিন্তু মেজকাকীমার আগ্রহে মায়েরা বাবার সঙ্গে যেতেন নিজেদের শাড়ী ও আমাদের ফ্রক কিনতে। সেদিন আমাদের উৎসাহ থাকত প্রবল। ওঁরা থাকবেন না বলে সকাল সকাল বাড়ির সকলের খাওয়া মিটে যেত।

সারা দুপুর আমরা ছোটরা নিজেদের ইচ্ছেমত খেলতাম। বিকেল হলেই ঘন ঘন বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতাম কখন ওঁরা ফিরে আসেন। সেদিন কচুরী, তরকারি, মিষ্টি এইসব ভাল ভাল জলখাবারও নিয়ে আসতেন। বিকেল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার সময় বাবাকে ফিরতে দেখতাম হাতে দুটো বড় বড়

ব্যাগ নিয়ে। তখন কদমতলা বাসস্ট্যান্ড থেকে হেঁটে আসতে হত। তার কিছুক্ষণ পরে মেজ কাকীমাকে একটু তাড়াতাড়ি আসতে দেখতাম খাবারের প্যাকেট নিয়ে। সবাই না এলে ব্যাগ খোলা হবে না, সেই জন্য আমরা কৌতূহল চেপে নীচের রকেই দাঁড়িয়ে থাকতাম। তার মিনিট পাঁচেক পর ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে আসতেন সেজকাকীমা। সবার শেষে গুট গুট করে ঘোমটা মাথায় দিয়ে আসতেন আমাদের মা।

তখন আমরা নিশ্চিন্ত হতাম। খাবারের প্যাকেট রাখা হত রান্নাঘরে, আর কাপড়ের ব্যাগ ঠাকুমার ঘরে। মায়েরা গা ধুয়ে এসে চা বসিয়ে আমাদের খেতে দিতেন। কচুরী তরকারি মিষ্টি সবাই মিলে একসঙ্গে বসে খেতাম। তারপর অপেক্ষা করতাম কখন কাপড় জামা দেখা হবে। মায়েরা চা জলখাবার খেয়ে ব্যাগ থেকে কাপড় বের করতেন। তখন আমাদের আনন্দ দেখে কে? সবাই সেই নতুন কাপড়ের গন্ধ শুঁকতাম। মনে হত যেন পুজো এসে গেছে। নিজেদের নতুন জামা তখনই পরে দেখতাম। প্রত্যেকের জামাই যথেষ্ট বড় হত। তখন বড়দের ধারনা ছিল একটু বড় বড় না নিলে পরের বছরের আগেই ছোট হয়ে যাবে। নতুন জামা পেয়ে আনন্দে মন ভরে উঠত। প্রত্যেকেরই জামা পছন্দ হত। আসলে সন্তুষ্টি ছিল মনে। আমরা পুজোয় নতুন জামা পরব, খেলব, মজা করব এই আনন্দে ভরপুর থাকতাম।

অনেক পরে শ্রী শ্রী মায়ের কথা পড়ে মনে হয় – সত্যিই "সন্তোষের সমান ধন নাই।" সন্তুষ্টি থাকে মনের ভিতর, আর তাতেই সুখ, আনন্দ। ■

পুজো এলো

রিয়া মিত্র

পুজোর ছোঁয়ায় লাগলো মনে 'দে দোল দোল'।
দোল লেগেছে কাশের বনে উঠলো বেজে মাদল।
মাদল-সুরে উমা আমার আসছে গজে দুলে।
দুলে দুলে মায়ের আশিস পড়ছে শিউলি ফুলে।

ফুলে ফুলে ভরে আছে ছোট্ট উমার পসার।
পসার ভালো জমলে আজ সুযোগ পাবে কেনাকাটার।
কেনাকাটা করবে সে আজ ঘরে রয়েছে ভাই।
ভাই ছাড়াও রুগ্ন বাবার জন্যও কিছু চাই।

চাই যে আরও অনেক কিছু রোজ দু'মুঠো অন্ন।
অন্ন ঘরে না থাকলে যে জীবনটাই বিপন্ন।
বিপন্ন মুখে হাসি আজ তুলবে বুঝি উমা।
উমাই যে স্বয়ং মোদের দেবী অন্নপূর্ণা। ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/xnih/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/buzn/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/mjwo/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **‘গুঞ্জন’এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**

কিংকর্তব্যবিমূঢ়

প্রণব কুমার বসু

মুঠোফোন কেনার যে এতো ঝামেলা সেটা কি আর আগে জানতাম! পুরানো ফোনটা বিকল হয়ে যাবার মুখে সচল রাখতে নানান প্রচেষ্টা – নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি। এমনকি কালীঘাটে পুজো দেওয়াও বাদ যায়নি।

সকলের পরামর্শ - দাদু এসব ফোন এখন আর চলে না। কত আর টেপাটেপি করবেন। সত্যিই তাই! এইতো সেদিন টিপলাম চার হয়ে গেল আট - মধুসূদনকে ফোন করতে গিয়ে এক ভদ্রমহিলার কাছে কী ঝাড়টাই না খেলাম। আবার বলে কিনা - ইস্টুপিড!

আজ সকালে পুজোআচ্চা সেরে সোজা চলে গেলাম নতুন মোবাইলের দোকানে। হাত স্যানিটাইজ করে ঠান্ডা ঘরে ঢুকতেই এক এলোকেশী অষ্টাদশী এগিয়ে এসে বলল, 'হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ স্যার?' প্রথমে একটু থতমত খেলেও নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'ইয়ে, মানে একটা মোবাইল ফোন কিনতে এসেছি...'

— 'দ্যাটস্ গ্রেট' বলে ইশারায় একটা কাউন্টার দেখিয়ে দিল সে। কাউন্টারের ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, 'কী কী

ফিচার চাইছেন?’ মনে মনে ভাবলাম আমি কি এখানে থার্টি সিক্স টোয়েন্টি ফোর থার্টি সিক্স দেখতে এসেছি নাকি!

উত্তর না পেয়ে ছেলেটা আবার জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি কি শুধু ছবি তোলেন, ফোন করেন আর ফেসবুক দেখেন? তাহলে টু জিবি RAM হলেই ...’

আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, ‘না না আমি RUM নয় WHISK...’ এবার ছেলেটা বেশ বিরক্ত হয়েই পাশের ছেলেটাকে বলল, ‘একটা টু জিবি RAM আর থার্টি টু জিবি Storage-এর টাচ ফোন দে।’ আমাকে টাচ করার আগেই সরাসরি এক লাফে দোকানের বাইরে! আমার এই পুরনো টেপাটেপি মুঠোফোনই ভাল। ■
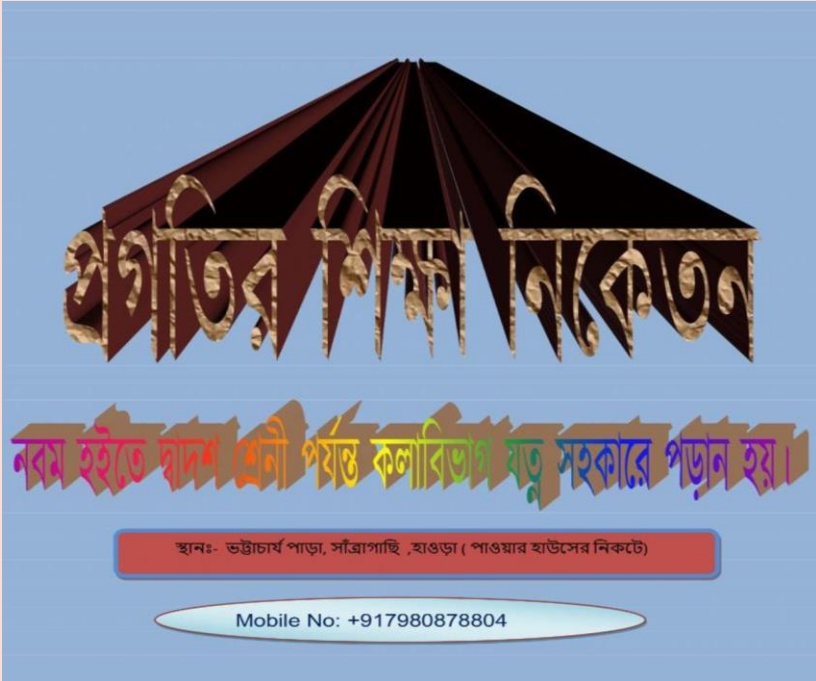
এবার পুজো অন্যরকম

গোবিন্দ মোদক

শিউলি ফুলকে কাছে ডেকে বলল হেসে কাশ,
এবার তো ভাই যেতে হবে আসছে আশ্বিন মাস!
পদ্ম-শালুক বললো এসে -- চিন্তা কিছু নাই,
প্রতিবার তো এ সময়ে একই সঙ্গে যাই!
স্থলপদ্মও এসে গেছে শিশিরও যাবে সঙ্গে,
একই সঙ্গে টিকিট কাটো শারদীয়া বঙ্গে!

যাওয়ার পথে পদ্ম হাসলো রহস্যময় হাসি,
বললো এবার প্যান্ডেলেতে লোক হবে না বেশি!
শুনেছি নাকি ওখানে কি এক চলছে অতিমারী,
এটা কোরো না, ওটা কোরো না দুর্ভাবনা ভারী!
বললো শালুক - ব্যাপারটা কী খুলে বলো দিদি,
পঞ্জিকাতে লেখা ছিল কি অতিমারীর বিধি?

পদ্ম বললো - পৃথিবী জুড়ে দাপায় করোনাসুর,
মানুষকেই বধ করে সে, ছাড় দিয়েছে পশুর!
তাই মা দুগ্গা করবে এবার করোনাসুরকে বধ,
অন্য ভূমিকায় মহিষাসুর -- মায়ের সাংসদ!
এবারে তাই সবাই খুব সাবধানেতেই থাকবে,
মুখে মাস্ক, সঙ্গে সবাই স্যানিটাইজার রাখবে!

কাশ বললো - ঠিক বলেছো, এই কথাটাই সত্যি,
করোনাসুরের ভীষণ দাপট মিথ্যে নয় একরত্তি!
তাই সাবধানে যাওয়া-আসা, সাবধানেই থাকা,
দূরের থেকেই কোলাকুলি --- এটা মনে রাখা !
প্যান্ডেলের সব ঠাকুরের মাস্ক থাকবে মুখে,
দর্শক নির্ঘাত চমকে যাবে প্যান্ডেলেতে ঢুকে!! ■

পুজোর চিঠি প্রিয়কে

প্রগতি দাস

পূজনীয় প্রিয়,

নিশ্চয়ই সম্বোধনটা পড়ে মনে মনে খুব হাসছ! ভাবছ এরকম বেমানান সম্বোধন আমার মাথায় এল কিভাবে? কিন্তু বিশ্বাস করো আমার কিন্তু এটাই উপযুক্ত মনে হয়েছে। প্রিয় হয় প্রেম থেকে আর প্রেমকে পূজা না করলে অন্তরে বরণ করলাম কিভাবে! জানি ভাবছ এসব তত্ত্বকথা আবার কেন? জানো, রবি ঠাকুর বলেছেন, "তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে। যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেমজালে।" জানি তোমার নজরুল পছন্দ বরাবর। কিন্তু আমার যে রবি ঠাকুরই সম্বল।

হয়তো তোমার মনে হচ্ছে এত আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে চিঠি লিখছি কেন? যদি বলি সেই পুরোনো দিনগুলো ফিরে পেতে অত্যাধুনিক ব্যবস্থাগুলো সঙ্গ দিচ্ছিল না, কিংবা যদি বলি আমি আজও পারিনি আধুনিক হতে; ভীষণ অবাক হবে কি! আজ কাগজ কলমের সাথে যত সখ্যতা জমিয়েছি তা হয়নি ঐ যন্ত্রগুলোর সাথে।

জানো. তোমার দেওয়া মাধবীলতা গাছটায় ফুল ধরেছে। তার গন্ধ যেন তোমার উপস্থিতি জানান দেয়। আমি নতুন

পায়েস রাঁধা শিখেছি। শিখেছি খোঁপায় জুঁই দেওয়া। আর শিখেছি অপেক্ষা করা।

আমার দিনগুলো একইভাবে কাটছে, দৈনিক রোজনামচায়। তবে দিনশেষে নীরবতা ভাঙে তোমার স্মৃতি। তোমার দিনলিপিতেও কি আমি আছি? দেখেছো এতক্ষণে তোমার কুশলটুকুও জানতে চাইনি। নিজের কথা বলতেই ব্যস্ত। কেমন আছো তুমি? ব্যস্ততাই বুঝি নিত্যসঙ্গী! তাই বোধ হয় খোঁজ নেওয়ার অবসর মেলে না!

তোমার নামে কেনা বাসন্তী রঙা পাঞ্জাবিটা তোলা আছে আলমারিতেই। জানি পাঞ্জাবি তোমার না-পসন্দ। তবুও কিনেছি আবারও। শেষবার বলেছিলে বৃষ্টি ভেজা বুনো গন্ধ তোমার প্রিয়। বাজার ঘুরে সেই গন্ধ এনেছি তোমার জন্য।

সামনেই পুজো। হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাকি মাত্র। তাই হয়তো তোমার উপহার পাঠানোর এত তাড়া। বারবার জিজ্ঞেস করেছো আমার কি চাই? উত্তর দেওয়া হয়নি। আজ অনেক ভেবে দেখলাম তোমাকে ছাড়া উপহারের কোন গুরুত্বই খুঁজে পাই না।

শেষবার যে বইখানা দিয়েছিলাম, ঐ যে যাতে 'বৃষ্টি থামার পরে' গল্পখানি আছে; পড়েছো সেখানা? নাকি আজও মলাটের আবডালেই ফেলে রেখেছো!

গতবারের যে কাঁকন জোড়া পাঠিয়েছিলে, পড়িনি বলে অভিমান করে একটিও কথা বলোনি পুরো পুজোয়, এবারে

সেখানা পড়েছি। মানতেই হয় তোমার পছন্দখানি সেরা।

ওহ, ভুলেই গিয়েছিলাম বলতে, প্রতিবারের মতোই এবারও শারদীয়া পত্রিকা কিনে রেখেছি তোমার জন্য। জানি বলবে, এতটুকু আগ্রহ পাও না এসবে, তবুও শারদীয়া পত্রিকা ছাড়া পুজো যে অসম্পূর্ণ। আচ্ছা অনেক কথা বললাম। আর বেশি দীর্ঘ করব না চিঠি।

আজ মহালয়া। তোমার কাছে এই চিঠি যখন পৌঁছাবে তখন হয়তো মায়ের বোধন হবে। হয়তো একলাই কেটে যাবে এবারের পুজোও। তবুও যদি সময় হয়, একটিবার এসো।

শেষ একটি কথা-হয়তো প্রতিবারই বলি...(তোমার) শূন্যতা অনুভব করা যদি ভালোবাসা হয় তবে...

ইতি-

প্রেয়সী ■

পাণ্ডুলিপির তরফ থেকে

সকল লেখক, পাঠক ও শুভাকাঙ্ক্ষী

বন্ধুদের জানাই

শারদীয়ার আন্তরিক অভিনন্দন...

গুঞ্জন পড়ুন ~ গুঞ্জন পড়ান
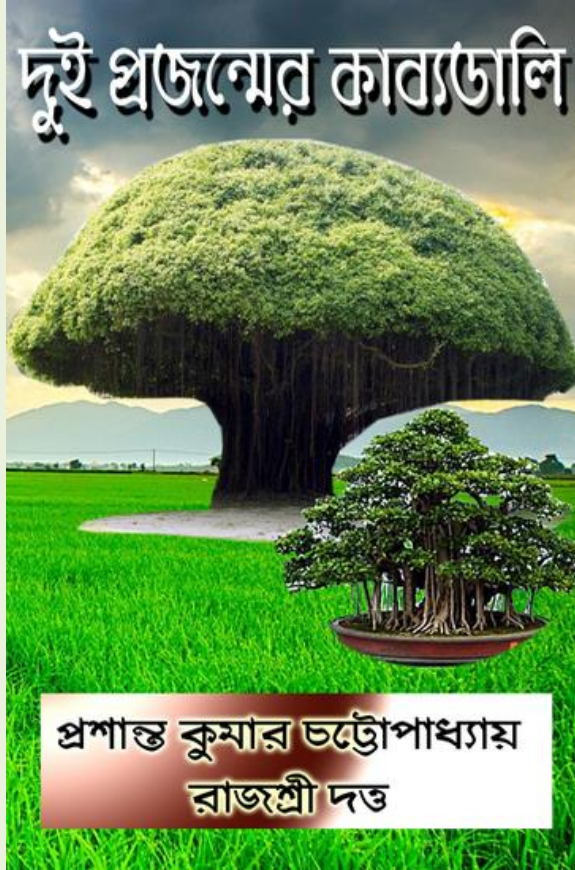
দুই প্রজন্মের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে, বর্তমানের কিছু চিত্র শুধু ভাষার মাধ্যমে একত্রে উপস্থাপন করেছেন দুই প্রজন্মের দুই কবি। আধুনিক কবিতা প্রেমীদের জন্য একটি অসামান্য কবিতা সংগ্রহ।

প্রাপ্তিস্থলঃ 1) www.flipkart.com

(Search Words: dui-projonmer-kabyadali)

2) E-mail: contactpandulipi@gmail.com

আমি-আমিত্ব-আমার সত্তা

মায়াশিখা চক্রবর্তী

নিশ্চুপ রাতে বারান্দায় একাকী বসেছিলাম, হঠাৎ করে ভীষণ যুদ্ধ বেঁধে গেল আমার সাথে আমার নিজের। আমার আমিটা প্রশ্ন তুললো, 'কে আমি? এই আমার কোনো নিজস্ব সত্তা আছে কি? কোনো একদিন এই আমির পরিচয় ছিল পিতার কন্যা বলে, পরে এই আমিটাই পেল স্বামীর পরিচয়ে পরিচিতি, অবশেষে এই আমির বাঁচা সন্তানের মায়ের পরিচয়ে। আমার এতো পরিচিতির মধ্যে আমার আমিটা কোথায়, কোথায় আছে আমার নিজস্ব পরিচয়? আজ একা নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেবলই মনে হচ্ছে আমার এই আমিত্বটা যেন আমার কাছে আমারই এক শরীরী ছায়া। সত্যিই কি তাই, কে দেবে এর উত্তর?'

প্রকৃতির মায়ায় স্তব্ধ চারিদিক, শুধু গাঢ় অন্ধকারে শোনা যাচ্ছে আমার নিজের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। নিস্তব্ধ নিঝুম প্রকৃতির মাঝে রাতের অন্ধকারে কেবল আমার প্রশ্ন ছুটে বেড়াচ্ছে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। এই আঁধারে ঢাকা প্রকৃতির কাছেই আমি একাকী দাঁড়িয়ে খুঁজে পেতে চাই আমার আমিত্বকে। কারণ আমি জানি সংসারের দায়িত্বের ভিড়ে আমি কখনোই খুঁজে পাবো না আমার আমিকে, ফিরে পাবো না নিজের সত্তাকে। সামনে বিশাল আকাশের নীচে, নিস্তব্ধতা মুখর পরিবেশে একাকী এই বারান্দায় বসে আমি ঠিক খুঁজে পাবো

জাগরণ

আমার আমিকে, যে আমিটা হবে একান্তই আমার নিজস্ব, যে আমিটা হবে আমার কাছে ভীষণ দামী। ভাবতে অবাক লাগছে এতদিন আমি বেঁচে আছি আমিহীন হয়ে। সকালের হাস্যোজ্জ্বল রোদ্দুর থেকে রাতের অভিমানী অন্ধকারের কোথাও নেই আমি, নেই আমার কোনো নিজস্ব সত্তা। সত্তাহীন বাঁচার কি কোনো মানে আছে, নাকি কোনো মূল্য আছে এই বেঁচে থাকার? আজ আমি এই প্রশ্ন নিয়ে সামনাসামনি হয়েছি আমার কাছে, তাই গোল বেঁধেছে আমার সাথে আমার।

আমি চিরদিন আমার আমিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে ভয় পেয়েছি, ভেবেছি অন্যেরা আমায় যেভাবে চালাবে আমার সেভাবেই চলা উচিত। কারণ জানি এটাই সংসারের চিরাচরিত নিয়ম। এই অনিচ্ছাকৃত জীবন কাটাতে কাটাতে আমি নিজের সত্তাকেই ভুলে গেছি, নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছি, হারিয়ে ফেলেছি আত্মবিশ্বাস। আজ আমি বেঁচে আছি একটা রোবটের মতো। তাই আমি একান্তভাবে খুঁজে চলেছি আমার আমিত্বকে। কারো কন্যা, বা কারো পত্নী, কিংবা সন্তানের মায়ের পরিচয়ে নয়, আমি বাঁচতে চাই আমার নিজের পরিচয়ে। শুধুমাত্র আমার আমি হয়ে জীবনটাকে চালাতে চাই নিজের মূল্যবোধে।

এভাবে নিজের প্রশ্নে নিজেই জর্জরিত হয়ে এক সময় ভেতর থেকে উত্তর পেলাম, প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব সত্তা তার ভেতরেই থাকে, তাকে নিজেকেই জাগিয়ে তুলতে হয়, নিজের নিজত্বকে চিনে নিতে হয় এই সাংসারিক ভিড়ে

থেকেই। সাংসারিক দায়দায়িত্বের ভিড়ে নিজের সত্তাকে একেবারে ভুলে যেতে নেই। আমি কে, আমি কি, আমার নিজস্বতা কি, তা নিজেকেই বুঝতে হবে। আমি নিজে যদি নিজেকে চিনতে পারি তবেই নিজের সত্তাকে খুঁজে পাবো, আর তখনই নিজের পরিচয়ে বাঁচতে পারব।

মনের ভেতরে লুকোনো আমিটার কথা শুনতে শুনতে ক্রমশঃ আমার আমিত্বের অনুভূতিতে ডুবে যাচ্ছি, মনের কথা যত শুনছি ততই যেন নিজেকে খুঁজে পাচ্ছি, খুঁজে পাচ্ছি নিজের সত্তাকে। জঞ্জালময় যত অবাঞ্ছিত বোধ উড়ে গিয়ে সেখানে জায়গা নিচ্ছে এক নতুন আমিত্বের বোধ। এবার এই আমিত্বকে আমি কিভাবে লালন করবো তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আমার ওপর।

এতদিনে আমার মধ্যেকার আমিকে খুঁজে পেয়ে মনটা আনন্দে ভরে গেল। তাকিয়ে দেখি রাতের অন্ধকার আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে, পূবদিকের নবারুণের ছটায় আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে। একটা নতুন সকাল এই নতুন আমিকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, রোজের চেনা ভোরের গন্ধে এক নতুন অনুভবের গন্ধ মিশে মনটাকে জুড়িয়ে দিল। এই নব প্রভাতে আমি চিনলাম আমার আমিকে, আমার সত্তাকে, আমার আমিত্বকে, যে আমিত্ব দেয় শক্তি, দেয় নিজের পরিচয়ে বেঁচে থাকার সাহস, ঘটায় জীবনের বিন্যাস, দেয় স্বস্তি। ■
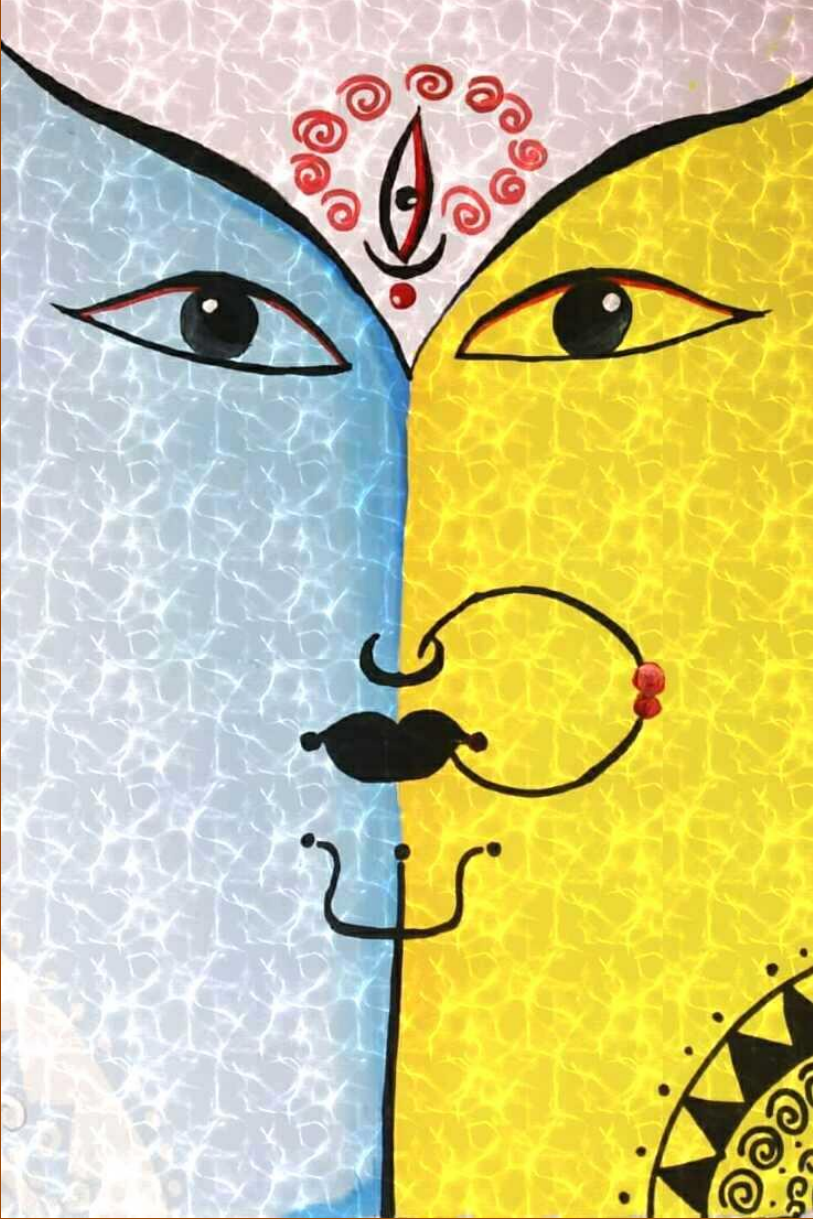
হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ ত্রিনয়নী...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জি ✧ বয়সঃ ১২ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

ভ্রমণ-কাহিনী

তীর্থন উপত্যকার দেশে

সমীর দাস

হিমাচল প্রদেশে গ্রেট হিমালয়ান ন্যাশনাল পার্ক, সেখানে হংসকুণ্ড থেকে তীর্থন নদী নাচতে নাচতে নেমে আসে। মান্ডি শহরের কাছে এসে সে বিপাশা নদীতে মিশে যায়। সেই তীর্থন উপত্যকা ও তার আশেপাশের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কথাই বলব এবার।

তীর্থন:- মান্ডির পর কুলু মানালীর পথে ওউট থেকে ডান দিকে চলে যেতে হয়। ওই পথে জিভি, সোঁজা হয়ে জালোরি পাস পেরিয়ে সিমলা। মাঝে বামদিকে তীর্থন, কুলু উপত্যকার অংশ।

দিল্লী থেকে রাতে যাত্রা শুরু, পরদিন সকালে উপত্যকার দোরগোড়ায় পৌঁছাই। মাঝে শানগড় দেখে আসি। ঘাসে ছাওয়া বিস্তীর্ণ সমতল, আজকাল পর্যটকেরা এখানে আসতে শুরু করেছে। খাজিয়ার হ্রদের ধারে আজকাল তারা খুব ভিড় বাড়ায়, এই জায়গাটি জনপ্রিয় হচ্ছে। শুনচুল মহাদেবের মন্দির আছে এখানে। পরিষ্কার, পরিছন্ন প্রকৃতি। এখনও মানুষের উপদ্রব তেমন নেই, বেশ ভালো লাগল। এবার তীর্থনের পাশে পাশে যাত্রা। নদী যায় নীচে, আমি চলি উপরে।

চারধারে ভেজা সবুজে অপার শান্তি। মাঝে মাঝে কিছু বাড়ি ঘর। এখানেও প্রায় সবই হোম-স্টে, কিছু বিলাসবহুল রিসর্টও আছে। মোহিত হয়ে দেখি উচ্ছল চঞ্চল তীর্থনকে। মাঝে মাঝে গতিপথে বড় বড় পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে নুড়ি পাথরের উপরে উপরে বয়ে চলেছে। বেশী গভীর নয়, কিন্তু প্রবল বেগে বহমান। স্বচ্ছ জল, তল অব্দি দেখা যায়। মাঝে মাঝেই থেমে পড়ি, অবাক হয়ে দেখি সেই বেগবতীকে। কি তীব্র গতি, কি প্রাণশক্তি নিয়ে, সব বাঁধা পেরিয়ে, নেচে নেচে, গানে গানে ছুটেছে লক্ষ্যে।

নদীর ওধারেও পাহাড় উঠে গেছে, ওধারেও কিছু রিসর্ট। পুল নেই, ট্রলিতে পার হতে হয়। বড়ই বিপজ্জনক, তাই এধার থেকেই দেখি। পাহাড়ের ওপারে কাসোল অঞ্চল, তারপর মূল কুলু উপত্যকা। ওপারেই একদিকে গ্রেট হিমালয় ন্যাশনাল পার্ক। প্রচুর আপেল গাছ, আপেলে ভর্তি। দেখতে তেমন লোভনীয় নয়, স্বাদেও একটু অন্য রকম। গাছ থেকে সদ্য পাড়া সেই আপেল অনেকটা কিনি। এক জায়গায় দেখি ট্রাউট মাছের চাষ হচ্ছে। কেনা যায়, কিন্তু রান্নার ব্যবস্থা না থাকায় সেই দুষ্প্রাপ্য মাছের স্বাদ নেওয়া গেল না। দেখেই মন ভরিয়ে, দর্শনে অর্ধভোজন করে এগিয়ে চলি।

অবশেষে ওপারে যাওয়ার একটি পুল। ওধারে গিয়ে, কিছুদূর পরে আরেকটি পুল। সেখানেই থামলাম। পুল

পেরিয়ে ছোট্ট একটি লোকালয়। তীর্থন এখানে বামদিকে বেঁকে গেছে, তার দুধারেই রাস্তা, তবে কাঁচা। পুলের এধারে রাস্তা নাকি গেছে ভিতরের কিছু গ্রামে, এদিকে বেশ ঘন গাছপালা। ওপারের রাস্তা গেছে ন্যাশনাল পার্কে।

পার্কের ভিতরে থাকা ইত্যাদির ব্যবস্থা নেই, তাঁবু ইত্যাদি নিজেই জোগাড় করে বিশেষ অনুমতি নিলেই প্রবেশ সম্ভব। এ যাত্রায় তেমন কিছুই করিনি, না পরিকল্পনা ছিল। তবু ভাবলাম প্রবেশদ্বার অব্দি যাই। তাই পুল পেরিয়ে ঐদিকেই চলি। কিছুদূর গিয়ে রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ, অগত্যা পদযাত্রা। এইবার যেন আসল আনন্দ। কি সুন্দর দৃশ্য! পাহাড়ের ধার ঘেঁষে রাস্তা, সে পাহাড়ে খুব একটা সবুজের বাহার নেই। কিন্তু অন্য পাশে তীর্থন সগর্জনে বইছে। নদীর ওপার ঘন সবুজ। লোকজন বলে কিচ্ছু নেই। এখানে যেন কেউ কোনদিন আসেনি। নদীর কলতান ছাড়া কোন আওয়াজ নেই। সেই ছবি দেখতে দেখতে, সেই গান শুনতে শুনতে, যেন অভিযানে চলা। বিহ্বলতা বাড়ে, ফলত বেশ কয়েকবার পদস্খলন। প্রবেশদ্বারে পৌঁছে দেখি, সেটা বন্ধ। কেউ নেই, কেউ আসেও না বোধ হয়। কিছুটা সময় সেখানে কাটিয়ে, প্রবেশদ্বার থেকে প্রবেশ বিনা ফিরে আসা। মন খারাপ হয়েছিল বটে, তবে অতটা নয়। প্রবেশের সুযোগ না পাওয়াটা জীবনে তো বারে বারে হয়, তাই বোধ হয়। তীর্থনের ধারে এক হোমস্টে-তে রাত কাটে

নিস্তব্ধতায় কেবল নদীর গান শুনে।

জালোরি পাস:- তীর্থনের ধারে এক মায়াবী রাত কাটিয়ে জালোরি পাসের পথে, বাঞ্জার উপত্যকা ধরে সোজা গ্রামের দিকে চলি। কুলু থেকে সিমলা যাওয়ার সবচেয়ে ছোট রাস্তা। আপেল ব্যবসার সুবিধায় কুলুর বাজার তৈরি। মাঝে ছোট ছোট গ্রাম, বানজার, জিভি, ঘিয়াগি। নীচে একটি ধারা বয়ে চলছে। আধুনিক নাম পুষ্পাবতী, তার ধারে নীচে জিভি। রাস্তা বেশ ভাল, চড়াই ভেঙ্গে ভেঙ্গে সোজা গ্রামে পৌঁছোই। আজ এখানে রাত্রিবাস।

পাহাড়ী রাস্তার পাশে কয়েকটি ঘর বাড়ি, বেশির ভাগই ঘর কাম হোমস্টে কাম দোকান। সহজ, অনাড়ম্বর কিন্তু কি শান্ত, রাস্তার ধারে কয়েকটি বাড়ি-হোটেল, দোকান। চারপাশে পাইন-দেবদারু বন। দূরে বরফ ঢাকা দূরে ধৌলাধর পর্বতশ্রেণী দেখা যায়। বহুদিনের সাধ পূরণ হল জালোরি পাসে পৌঁছে। সোজা গ্রাম থেকে কঠিন চড়াই পার হয়ে এই গিরিপথের মাথায় ১০,২৮০ ফুট উচ্চতায় আসি।

ছোট্ট এক ফালি জায়গা, মহাকালীর মন্দির আর কিছু দোকান। কতবার ফটো দেখেছি, আজ একদম চোখের সামনে। স্বপ্নপূরণে এক পরম প্রাপ্তি। প্রথমেই প্রচুর ফটো তুলি। তারপর দর্শণ করি মহাকালী মন্দির। তারপর এক কাপ চা নিয়ে বসি, নজর বোলাই চারদিকে। নীচে একদিকে ঘন বনের ফাঁকে সোজা গ্রাম দেখা যায়। ওপরে দেখি

বরফে ঢাকা ধৌলাধার পর্বতমালা। অন্য দিকে পথ এঁকে বেঁকে নেমে যায় সিমলার দিকে। একটি গ্রাম নজরে পড়ে। মন্দিরের পেছনে একটি কাঁচা পথ, সেই পথে চলেছে ভেড়ার দল। পাহাড়ের ঢালে সবুজ ঘাসে আরও কিছু ভেড়ার দল। স্থির সবুজে চলমান হলুদে অপূর্ব দৃশ্য। একদিকে রোদ, অন্যদিকে ছায়া, তাই ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীন মহীরূহ দুইদিকে। মাঝে মাঝে গাড়ী আসে।

কিছুক্ষণ চলাচল, কথা বার্তা, মন্দিরে ঘন্টা বাজে। জালোরি আবার নৈঃশব্দ্যে ফিরে যায়। যেন ছিলাম পৃথিবীর মাথায়, ভুলিনি সেখানে সেই সময়টুকু। অনেকটা সময় সেখানে কাটিয়ে ফিরে আসি সোজা গ্রামে। ওখানেই থাকা কয়েকটা দিন। পাহাড়ী রাস্তার পাশে কয়েকটি ঘর-বাড়ি, বেশির ভাগই ঘর কাম হোম-স্টে কাম দোকান। সহজ, অনাড়ম্বর কিন্তু কি শান্ত! সেরকমই একটি জায়গায়, দোতলায় ঠাঁই নিয়েছি। বেশ কিছুটা জায়গা, তবে ঢালে ঢালে। তারই ওপর ছোট ছোট খেত, প্রচুর আপেল গাছ। ঢালে ঢালে জায়গাটা নেমে গেছে নীচে উপত্যকায়। ওপারে আরেক পাহাড় উপরে উঠে গেছে, পাইন গাছে মোড়া। তার মাঝে আরেকটি গ্রাম দেখা যায়, ওটি মূল সোজা গ্রাম। অন্য দিকে তাকালে, বহুদূরে বরফ ঢাকা পাহাড় দেখা যায়, ধৌলাধার পর্বতশ্রেণী।

সকালে আলু পরোটা আর ডিম ভাজার প্রাতরাশ,

তারপর এদিক ওদিক একটু ঘুরি। পর্যটনের মরশুম নয়, তাই একেবারে ফাঁকা। তারপর জানালার পাশে বই আর চায়ের ফ্লাস্ক নিয়ে বসা, কি অপার শান্তি!

চলমান বলতে কিছু পাহাড়ী গরু, মাঝে মাঝে সরকারী বাস আর ঘাস বা কাঠের বোঝা নিয়ে পাহাড়ী মেয়েরা। অসম্ভব পরিশ্রমী, শীতের সঞ্চয়ে ব্যস্ত। ক'দিন পরেই নাকি বরফে ঢেকে যাবে এ জায়গা।

রাতে দূরে গ্রামে টিম টিম আলো, আকাশেও তারা। পাইন বনে কীট-পতঙ্গের ঐকতানে গভীর নিদ্রা। খুব ভাল লাগে, যখন দেখি বাচ্চারা স্কুল যাচ্ছে বা আসছে, বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে স্কুল, এই সুদূর পাহাড়ী গ্রামেও বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে দেখে মন আনন্দে ভরে যায়। মাঝে মাঝে আবার যাই জালোরি পাসে, আশেপাশে জিভি, শৃঙ্গ ঋষি মন্দির, চেহনি কোঠি, সিরলোস্কার হ্রদ, রঘুনাথপুর গড় ঘোরা হয়।

গ্রামের নামটি জিভি। অনেক খোঁজখবরেও নামকরণের গল্পটি পেলাম না। সেখানে একটি জলধারা বইছে, গিয়ে মিশেছে সেই তীর্থন নদীতে। নাম বলে পুষ্পবতী, অবশ্যই একালের দেওয়া কাব্যিক নাম, আদি নামটি জানা গেল না। ছবির মত গ্রাম, আধুনিক হয়ে উঠছে। কিন্তু এখনো বেশ কিছু সাবেকী স্লেট পাথরের ছাদে কাঠের বাড়ি বেশ আছে। বেশির ভাগই আজকাল হোম-স্টে। উপরের রাস্তায় একটি

দোকানে বসে দেখছিলাম সেই ছবি।

গ্রামের ওপারেও আবার পাহাড়, কারসোগ উপত্যকা ওই দিকেই। পুষ্পবতীর ওপারে ওই দিকে বেশ ফাঁকা, পুল পেরিয়ে যাওয়া যায়। পুল পেরিয়ে, পুষ্পবতীর ধারে গেলাম। স্বচ্ছ জলের ধারা বয়ে চলেছে খর বেগে, জলের নীচে নুড়ি-পাথর পরিষ্কার দেখা যায়। মনের আনন্দে পা ভেজালাম ঠান্ডা জলে, তারপর পাশে সবুজ ঘাসে বসে অনেকক্ষণ চোখ ভেজালাম সেই অপূর্ব দৃশ্যে, কলতান গান শুনতে শুনতে। কিছুটা দূরে একটি সুন্দর গাছবাড়ী, হোটেল। কিন্তু আজকাল বন্ধ, নইলে ওখানেই থেকে যেতাম। হঠাৎ কারসোগ উপত্যকার কথা মনে হল, রাস্তা সেখানেই গেছে, সেই চিন্ডিতে। এ যাত্রা হবে না, তবু ভাবলাম কিছুটা দূর অব্দি যাই। কিছুটা যেতেই আরেকটি গ্রাম, নাম বোধ হয় বাহু। এগিয়ে যাই, গন্তব্য ঋষি মার্কণ্ডেয় মন্দির, গাদা গুশিয়ানি নামক একটি জায়গায়। ফটো দেখেছিলাম কোথাও। চারিদিকে সবুজ আর সবুজ, পাইনের বন আর ঘাস। ঘন সবুজ, হলদে সবুজ, ভেজা ভেজা ভাব।

এবার সামনে এক পুকুর, সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠ। একপাশে রাস্তা নেমে গেছে, দূরে আরেক গ্রাম নজরে পড়ে। সামনের রাস্তা খুবই খারাপ দশায়, আর এগোনো গেল না। পুকুরটি ছোট, কিন্তু সুন্দর। একদিকে পাইনের সারি। আশ্চর্য হলাম পদ্মপাতা দেখে, ফুল আসেনি এখনো।

পাহাড়ের কোলে স্বর্গের টুকরো যেন। মন অপার শান্তিতে ভরে যায়। ধ্যানমগ্নের মতোই বসে ছিলাম, হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হল। যেন এই স্বর্গে ফুলবৃষ্টি হচ্ছে। অগত্যা ফেরার পালা।

আজও শহরে দমবন্ধ হয়ে এলে, সেই অনামা অখ্যাত পুকুরের ধারে চলে যাই মনে মনে। গভীর প্রশান্তিতে কটা দিন ছিলাম সেই বিশুদ্ধ হাওয়া ভরা, সবুজে ঘেরা নিস্তব্ধ পাহাড়ী গ্রামটিতে। টিভি ছিল, নেটও ছিল তবুও দেখার ইচ্ছে ছিল না, দেখেছি শুধু পাহাড়ী প্রকৃতি, জীবন। এরপর ফেরার পালা। আবার সেই জালোরি পাস পেরিয়ে নারকান্ডা, সিমলা হয়ে হিমালয়ান এক্সপ্রেসওয়ে ধরে পৌঁছলাম প্রদূষিত রাজধানীতে। ■